ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1812-1819
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.404

গান্ধীর নন্দনতত্ত্ব: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

শুভঙ্কর পোদ্দার, *গবেষক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper examines Mahatma Gandhi's philosophy of art and aesthetics. Although Gandhi is primarily known as a political thinker, his writings reveal a consistent and original aesthetic theory. Against the dominant Western tradition that treats art as autonomous and separable from moral life, Gandhi argued that art, labour, and ethics are inseparable. For Gandhi, beauty is not an independent quality to be appreciated in isolation— it is the natural outcome of honest, ethical, and purposeful human activity.

The paper traces the philosophical sources of Gandhi's aesthetics, including the influence of Tolstoy and Ruskin from the Western tradition, and the Upanishads, the Bhagavad Gita, and Jain philosophy from the Indian tradition. It then analyses the central pillars of his aesthetic thought: his rejection of 'art for art's sake,' his elevation of hand labour as a form of creative expression, his critique of industrialism in 'Hind Swaraj,' and his use of the charkha as both a philosophical symbol and an aesthetic ideal. The paper also considers satyagraha as a lived aesthetic practice in which moral and artistic values merge.

While noting the limitations of Gandhi's position, the paper argues that his ethical aesthetics remains deeply relevant today— particularly as a critical response to the commodification of art and the displacement of artisan labour in the digital age.

Keywords: Gandhi, aesthetics, ethics, labour, satyagraha, folk art

দর্শনের ইতিহাসে নন্দনতত্ত্ব বা aesthetics সবসময়ই একটি কেন্দ্রীয় প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে: শিল্প কি কেবল সৌন্দর্যের জন্য, নাকি তার একটি নৈতিক উদ্দেশ্য আছে? পাশ্চাত্য দর্শনে কান্ট-এর 'disinterested pleasure' থেকে শুরু করে Oscar Wilde-এর 'art for art's sake' পর্যন্ত একটি ধারা শিল্পকে নৈতিকতার বাইরে স্বতন্ত্র একটি ক্ষেত্র হিসেবে দেখেছে। এই ধারার মূল যুক্তি হলো, শিল্পের নিজস্ব একটি অভ্যন্তরীণ যুক্তি আছে— সৌন্দর্য নিজেই একটি পরম মূল্য এবং তাকে নৈতিকতা বা রাজনীতির মানদণ্ডে বিচার করা অনুচিত। Alexander Baumgarten থেকে Benedetto Croce পর্যন্ত পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্বের মূলধারা এই শিল্পের এই স্বতন্ত্র ধারণাকেই পোষণ করে এসেছে।

এই ধারার বিপরীতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী শিল্পকে জীবনের সঙ্গে, শ্রমের সঙ্গে এবং নৈতিকতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করে দেখেছেন। গান্ধীকে সাধারণত একজন রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ও স্বাধীনতা

সংগ্রামী হিসেবে দেখা হলেও, তাঁর লেখা, বক্তৃতা ও কর্মকাণ্ডের গভীরে একটি নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যা প্রচলিত শিল্পতত্ত্বকে মৌলিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

গান্ধীর নন্দনতত্ত্ব গড়ে উঠেছে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দুটি ধারার সমন্বয়ে। একদিকে Tolstoy ও Ruskin-এর নৈতিক শিল্পদর্শন, অন্যদিকে উপনিষদের 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' এবং ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্মের ধারণা— এই দুটি ধারা মিলিয়ে গান্ধী এমন একটি শিল্পদর্শন তৈরি করেছেন যা একই সঙ্গে দার্শনিকভাবে মৌলিক ও সামাজিকভাবে প্রাসঙ্গিক।

দার্শনিক উৎস ও প্রভাব

ক) Tolstoy-র প্রভাব: গান্ধীর শিল্পদর্শন গড়ে ওঠার পেছনে লিও টলস্টয়ের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। টলস্টয় তাঁর 'What is Art?' (১৮৯৭) গ্রন্থে পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্বের মূলধারার সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, পাশ্চাত্যের তথাকথিত 'উচ্চশিল্প' মূলত সুবিধাভোগী অভিজাত শ্রেণির বিলাসিতা। শিল্পের সংজ্ঞা নির্ধারিত হওয়া উচিত সৌন্দর্য বা আনন্দের মানদণ্ডে নয়, বরং তার নৈতিক বার্তা দেওয়ার ক্ষমতার মানদণ্ডে। অর্থাৎ যে শিল্প মানুষের মধ্যে নৈতিক অনুভূতি জাগাতে পারে এবং মানুষকে মানুষের কাছে নিয়ে আসতে পারে, সেটিই প্রকৃত শিল্প।[1]

১৯০৮-০৯ সালে গান্ধী ও টলস্টয়ের মধ্যে চিঠিপত্রের মাধ্যমে দার্শনিক মতের বিনিময় হয়।[2] টলস্টয়ের 'Letter to a Hindu' পড়ে গান্ধী অনুপ্রাণিত হন এবং শিল্পকে নৈতিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে দেখার ধারণাটি ভারতীয় সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন। তবে গান্ধী টলস্টয়ের ধারণাকে হুবহু গ্রহণ করেননি— তিনি তা রূপান্তরিত করেছেন। টলস্টয়ের আলোচনা মূলত ইউরোপীয় শিল্পজগতকে কেন্দ্র করে। গান্ধী সেই ধারণাটিকে ঔপনিবেশিক ভারতের দারিদ্র্য ও বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছেন।

খ) John Ruskin-এর প্রভাব: গান্ধীর জীবনে John Ruskin-এর 'Unto This Last' (১৮৬২) গ্রন্থটির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। বইটির মূল ভাবনাগুলো তাঁর নিজের গভীরতম বিশ্বাসের প্রতিফলন বলে তাঁর মনে হয়েছিল।[3]

Ruskin -এর মতে, পুঁজিবাদী অর্থনীতি শ্রমিকের কাজকে কেবল একটি পণ্য হিসেবে দেখে— সেখানে শ্রমিকের ব্যক্তিত্ব, তার সৃজনশীলতা, তার আত্মার প্রকাশের কোনো মূল্য নেই। তাঁর 'The Stones of Venice' গ্রন্থে Ruskin বলেছেন যে Gothic স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠত্বের পেছনে আছে কারিগরের সৃজনশীল স্বাধীনতা— সেখানে প্রতিটি পাথর কাটার মধ্যে একজন মানুষের আত্মার ছাপ লক্ষ্য করা যায়।[4] শিল্পবিপ্লবের পরবর্তীতে বিভিন্ন যন্ত্র সেই মানবিক মাত্রাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

গান্ধী Ruskin-এর এই ধারণাটিকেও ভারতের প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করেছেন। ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ভারতের হস্তশিল্পকে ধ্বংস করে তার পরিবর্তে ম্যানচেস্টারে তৈরি কলের কাপড় নিয়ে এসেছে। এই

---

[1] Tolstoy, Leo. *What is Art?* Translated by Aylmer Maude. Oxford University Press, London, 1929, Chapter 5.

[2] Collected Works of Mahatma Gandhi. Vol. 10, Publications Division, Government of India, New Delhi, 1963, pp. 160-175.

[3] Gandhi, M.K. *Autobiography: The Story of My Experiments with Truth.* Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1927, p. 298.

[4] Ruskin, John. *The Stones of Venice.* Smith, Elder & Co., London, 1851, Vol. 2, Chapter 6.

প্রক্রিয়ায় কেবল ভারতের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি— ভারতীয় কারিগরের সৃজনশীল আত্মাও এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁর খাদি আন্দোলন তাই শুধু একটি অর্থনৈতিক প্রতিরোধ নয়, এটি ভারতীয় শিল্পীদের নান্দনিক সত্তাকে রক্ষার একটি প্রতিরোধ।

গ) ভারতীয় দার্শনিক উৎস: গান্ধীর নন্দনতত্ত্বের শিকড় কেবল পাশ্চাত্য দর্শনে নয়, ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যেও গভীরভাবে প্রোথিত। বলা যায়, Tolstoy ও Ruskin তাঁকে যা দিয়েছেন তা ভারতীয় দর্শনের আলোয় আরও সমৃদ্ধ ও গভীর হয়ে উঠেছে।

উপনিষদের 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' সূত্রে সত্য, মঙ্গল ও সুন্দরকে অভেদ হিসেবে দেখা হয়েছে। এই ত্রয়ী গান্ধীর শিল্পদর্শনের একটি মূল ভিত্তি। তাঁর কাছে সুন্দর কেবল নৈতিক জীবনের মধ্য দিয়েই সম্ভব— যা সত্য নয়, যা মঙ্গলজনক নয়, তা সুন্দর হতে পারে না। এই ধারণাটি পাশ্চাত্যের aesthetic autonomy-র ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত।

ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্মের ধারণাও গান্ধীর শিল্পভাবনায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে।[5] গীতায় কৃষ্ণ বলেছেন, ফলের প্রত্যাশা না করে কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ কর্ম। গান্ধী এই ধারণাকে শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। একজন প্রকৃত শিল্পী বা কারিগর যখন খ্যাতি বা অর্থের প্রত্যাশা না করে কেবল সৃষ্টির আনন্দে ও সমাজের সেবায় কাজ করেন, তখনই সেই কাজ সর্বোচ্চ নান্দনিক মূল্য অর্জন করে। এই অর্থে চরকায় সুতো কাটা একটি আধ্যাত্মিক সাধনাও বটে।

জৈন দর্শনের অহিংসার ধারণাও গান্ধীর নন্দনতত্ত্বকে একটি বিশেষ নৈতিক রূপ দিয়েছে। যে শিল্প হিংসার উপর নির্মিত— মানুষের শোষণের উপর, প্রকৃতি-ধ্বংসের উপর— সেই শিল্প গান্ধীর কাছে অসুন্দর। বড় কারখানার যন্ত্রে তৈরি পণ্য কেবলমাত্র কারিগরের জীবিকা কেড়ে নেয় না, সেই উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে হিংসা নিহিত আছে— প্রকৃতির বিরুদ্ধে, মানুষের সৃজনশীল সত্তার বিরুদ্ধে। সেই হিংসাযুক্ত শিল্প প্রকৃত নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য বহন করতে পারে না।

এই তিনটি ভারতীয় ধারা— উপনিষদের সত্য-সুন্দরের অভেদ, গীতার নিষ্কাম কর্ম এবং জৈন দর্শনের অহিংসা— Tolstoy ও Ruskin-এর পাশ্চাত্য নৈতিক নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে মিলে গান্ধীর শিল্পদর্শনকে একটি অনন্য দার্শনিক কাঠামো দিয়েছে।

গান্ধীর শিল্পদর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য

ক) 'Art for Art's Sake'-এর প্রত্যাখ্যান: উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের শুরুতে পাশ্চাত্যে 'art for art's sake' আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল। Oscar Wilde, Walter Pater প্রমুখ শিল্পী ও চিন্তাবিদরা যুক্তি দিচ্ছিলেন যে শিল্পের কোনো বাহ্যিক উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয়— শিল্প নিজেই তার নিজের লক্ষ্য। Wilde-এর বিখ্যাত উক্তি অনুযায়ী, "All art is quite useless"— এবং এই 'uselessness'-এর মধ্যেই শিল্পের মহত্ত্ব। Kant-এর দর্শনেও শিল্পানুভূতিকে বলা হয়েছে 'purposiveness without purpose' অর্থাৎ উদ্দেশ্যহীন উদ্দেশ্যমুখিতা। গান্ধী এই ধারণাটিকে ভারতের বাস্তবতার নিরিখে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেননি। তিনি নৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে ধারণাটি খণ্ডন করেন।

নৈতিক স্তরে তিনি প্রশ্ন করেছেন, যখন ভারতের কোটি কোটি মানুষ অনাহারে, অপমানে ও দারিদ্র্যে দিন অতিবাহিত করছেন, তখন একটি সুবিধাভোগী শ্রেণি কেবল নিজেদের আনন্দের জন্য শিল্পচর্চা করবে—

[5] ভগবদ্গীতা, অধ্যায় ৩, শ্লোক ১৯।

এটি নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। 'Young India' পত্রিকায় তিনি লিখেছেন যে, যে শিল্প সাধারণ মানুষের জীবনকে স্পর্শ করে না, যা তাদের কষ্ট ও সংগ্রামের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না, সে শিল্পে তিনি কোনো প্রকৃত সৌন্দর্য দেখেন না।[6]

রাজনৈতিক স্তরে গান্ধী দেখিয়েছেন যে 'art for art's sake'-এর ধারণাটি মূলত একটি ঔপনিবেশিক ও শ্রেণি-বিভক্ত সমাজের পণ্য। এই ধারণা একটি বিশেষ শিক্ষিত ও সম্পন্ন শ্রেণির সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে বৈধতা দেয়। তাদের রুচি, তাদের সৌন্দর্যবোধই 'উচ্চশিল্প' হিসেবে স্বীকৃত হয়, আর সাধারণ মানুষের লোকশিল্প, হস্তশিল্প 'নিম্নমানের' বলে উপেক্ষিত হয়। গান্ধী এই সাংস্কৃতিক শ্রেণিবিভাজনকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তবে গান্ধী একথা বলেন না যে শিল্পে আনন্দের কোনো স্থান নেই। তাঁর মতে, প্রকৃত আনন্দ ও প্রকৃত সৌন্দর্য কেবল সেখানেই সম্ভব যেখানে শিল্প মানুষের জীবনের সঙ্গে, তার সংগ্রামের সঙ্গে ও তার মুক্তির সঙ্গে যুক্ত। নৈতিকতাবিহীন সৌন্দর্য তাঁর কাছে একটি অসম্পূর্ণ ও অন্তঃসারশূন্য ধারণা।

খ) শ্রমকে শিল্পের কেন্দ্রে স্থাপন: গান্ধীর শিল্পদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শ্রমকে শিল্পের কেন্দ্রে স্থাপন করা। প্রচলিত নন্দনতত্ত্বে শিল্পী ও কারিগরের মধ্যে একটি স্পষ্ট শ্রেণিবিভাজন আছে— শিল্পী সৃষ্টি করেন, কিন্তু কারিগর তৈরি করেন। 'Fine arts' ও 'craft'-এর এই বিভাজন পাশ্চাত্যের দার্শনিক চিন্তায় গভীরভাবে রয়েছে। গান্ধী এই বিভাজনকে মূলত শ্রেণি-বিভক্ত সমাজের একটি সাংস্কৃতিক প্রকাশ হিসেবে দেখেছেন এবং তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তাঁর কাছে একজন তাঁতি যখন হাতে কাপড় বোনেন, একজন কুমোর যখন মাটির পাত্র তৈরি করেন, একজন ছুতোর যখন কাঠের আসবাব নির্মাণ করেন— এই সৃজনশীল শ্রম প্রকৃত শিল্পসৃষ্টি থেকে কোনো অংশে কম নয়। বরং এই হস্তশিল্পে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও আত্মার প্রকাশ ঘটে, যা যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যে সম্ভব নয়। 'Harijan' পত্রিকায় গান্ধী লিখেছেন যে হাতের শ্রমের মতো মহৎকারী আর কিছু নেই, কারণ সেখানে মানুষের সত্তা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়।[7]

এই ধারণার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দিক আছে। ভারতে দীর্ঘদিন ধরে কারিগর শ্রেণি— কুমোর, তাঁতি, লোহার, ছুতোর— জাতিভেদ-প্রথার কারণে সামাজিকভাবে অবহেলিত হয়ে এসেছে। গান্ধী তাদের শ্রমকে শিল্পের মর্যাদা দিয়ে একটি গভীর সামাজিক বার্তা দিয়েছেন—যাঁরা সৃষ্টি করেন, তাঁরা সম্মানের যোগ্য।

গ) 'হিন্দ স্বরাজ' ও যন্ত্রসভ্যতার সমালোচনা: ১৯০৯ সালে রচিত 'হিন্দ স্বরাজ' গ্রন্থে গান্ধী আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার বিরোধিতা করেছেন।[8] যন্ত্র যখন মানুষের হাতের কাজকে প্রতিস্থাপিত করে, তখন শুধু কর্মসংস্থান নষ্ট হয় না— মানুষের সৃজনশীল আত্মাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারখানায় উৎপাদিত একটি কাপড় আর হাতে বোনা একটি কাপড়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু প্রযুক্তিগত নয়, নন্দনতাত্ত্বিকও। হাতে বোনা কাপড়ে কারিগরের ব্যক্তিত্ব, তাঁর সৃজনশীলতা ও তাঁর আত্মার প্রকাশ থাকে। যন্ত্রে উৎপাদিত পণ্যে সেগুলি অনুপস্থিত। গান্ধীর দৃষ্টিতে এই অনুপস্থিতি কেবল একটি অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, এটি একটি নন্দনতাত্ত্বিক ও নৈতিক বিপর্যয়।

---

[6] Gandhi, M.K. *Young India*, 11 August 1920. In *Collected Works of Mahatma Gandhi*, Vol. 18, p.132.

[7] Gandhi, M.K. *Harijan*, 1 February 1935. In *Collected Works of Mahatma Gandhi*, Vol. 60, p. 98.

[8] গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ. *হিন্দ স্বরাজ,* নবজীবন পাবলিশিং হাউস, আহমেদাবাদ, ১৯০৯, পৃ. ৩৫-৪২।

গান্ধী আরও দেখিয়েছেন যে যন্ত্রসভ্যতা মানুষকে তার নিজের সৃজনশীলতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। যখন একজন মানুষ কেবল একটি যন্ত্রের একটি অংশ হিসেবে কাজ করেন— একই কাজ বারবার করেন— তখন তাঁর মধ্যে যে সৃজনশীল সত্তা আছে তা ধীরে ধীরে মরে যায়। এই অর্থে শিল্পায়ন কেবল অর্থনৈতিক শোষণ নয়, এটি একটি নন্দনতাত্ত্বিক শোষণও।

ঘ) চরকা: একটি দার্শনিক প্রতীক: গান্ধীর চরকা শুধু একটি অর্থনৈতিক হাতিয়ার নয়। এটি একটি গভীর দার্শনিক প্রতীক, যা তাঁর সমগ্র শিল্পদর্শনকে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করে। চরকায় সুতো কাটার কাজে ধ্যান, শ্রম ও নান্দনিক সৃষ্টি একীভূত হয়— এই তিনটির মিলনই গান্ধীর আদর্শ শিল্পকর্মের সংজ্ঞা।

চরকার সামনে বসার মধ্যে গান্ধী দেখেছিলেন আত্মনিয়ন্ত্রণের সাধনা। মন স্থির হয়, হাত সক্রিয় থাকে, এবং সেই সাধনার ফলে একটি সুন্দর ও প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরি হয়। এখানে শ্রম, নৈতিকতা ও সৌন্দর্য পরস্পরের থেকে অবিচ্ছেদ্য। Bhikhu Parekh লিখেছেন যে গান্ধীর কাছে চরকা ছিল একটি সম্পূর্ণ জীবনদর্শনের প্রতীক, যেখানে ব্যক্তির আত্মিক বিকাশ ও সমাজের নৈতিক পুনর্গঠন একই প্রক্রিয়ার দুটি দিক।[9]

চরকার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নান্দনিকতাত্ত্বিক মাত্রা হলো তার সাম্যবাদী চরিত্র। এটি এমন একটি শিল্পকর্মের হাতিয়ার যা সকলের নাগালের মধ্যে। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত— সকলেই চরকা চালাতে পারেন। এই অর্থে চরকা গান্ধীর গণতান্ত্রিক নন্দনতত্ত্বের একটি বাস্তব প্রকাশ।

ঙ) লোকশিল্পের পুনর্মূল্যায়ন: গান্ধী ভারতীয় লোকশিল্পকে জাতীয় ও নৈতিক সংস্কৃতির ভিত্তি হিসেবে পুনর্মূল্যায়ন করেছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসন ভারতীয় লোকশিল্পকে 'primitive' ও 'inferior' বলে চিহ্নিত করে পাশ্চাত্য শিল্পরুচিকে আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই সাংস্কৃতিক আধিপত্য রাজনৈতিক আধিপত্যের মতোই গভীর ও ক্ষতিকর ছিল, কারণ এটি ভারতীয়দের নিজস্ব সৌন্দর্যবোধ ও সৃজনশীলতার প্রতি আস্থাহীন করে তুলেছিল।

গান্ধীর দৃষ্টিতে মধুবনী চিত্রকলা, মৃৎশিল্প, বাঁশের কাজ, তাঁত— এসব শিল্প পাশ্চাত্য শিল্পের চেয়ে কোনো অংশে নিম্নমানের নয়। বরং এই লোকশিল্পগুলো আরও সমৃদ্ধ, কারণ এগুলো সাধারণ মানুষের জীবন, বিশ্বাস ও সংগ্রামের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। এই শিল্পে সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ, তাদের আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও তাদের দৈনন্দিন সৌন্দর্যবোধ একীভূত হয়— যা গান্ধীর আদর্শ শিল্পের সংজ্ঞার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নৈতিকতা ও নন্দনতত্ত্বের অভেদ: গান্ধীর মতে aesthetics ও ethics দুটি আলাদা দার্শনিক ক্ষেত্র নয়। পাশ্চাত্য দর্শনে এই দুটি শাখাকে সাধারণত আলাদা রাখা হয়— নৈতিকতা প্রশ্ন করে "কী করা উচিত?" এবং নন্দনতত্ত্ব প্রশ্ন করে "কী সুন্দর?" গান্ধী এই বিভাজনটিকে মূলগতভাবে স্বীকার করতে চাননি। তাঁর মতে এই দুটি প্রশ্নের উত্তর একই জায়গায় পাওয়া যেতে পারে।

ক) "Truth is God": সত্য ও সৌন্দর্যের অভেদ: গান্ধীজি প্রথমে বলতেন "God is Truth"— ঈশ্বরই সত্য। পরে তিনি এই সূত্রটি উল্টে দিয়ে বললেন "Truth is God"— সত্যই ঈশ্বর।[10] এই পরিবর্তন কেবল ধর্মতাত্ত্বিক নয়, এর নন্দনতাত্ত্বিক তাৎপর্যও গভীর।

---

[9] Parekh, Bhikhu. *Gandhi's Political Philosophy: A Critical Examination.* Macmillan, London,1989, p. 114.

[10] Gandhi, M.K. *In Search of the Supreme*, Vol. 3. Edited by V.B. Kher. Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1962, p. 4.

যদি সত্যই ঈশ্বর হন, তাহলে সৌন্দর্যও সত্যের একটি প্রকাশ। উপনিষদের 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'-এর মতো গান্ধীর কাছে সত্য ও সুন্দর অভেদ হয়ে ওঠে। সত্যিকার সুন্দর কেবল নৈতিক জীবনেই সম্ভব। যে শিল্প মিথ্যার উপর নির্মিত, যে শিল্প শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে শিল্প বাহ্যত যতই চমকপ্রদ হোক না কেন, প্রকৃত অর্থে তা সুন্দর হতে পারে না। এই ধারণাটি গান্ধীর নন্দনতত্ত্বের কেন্দ্রীয় দার্শনিক ভিত্তি।

খ) জীবন নিজেই একটি শিল্পকর্ম: গান্ধীর শিল্পদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো— জীবন নিজেই একটি শিল্পকর্ম হতে পারে। নৈতিক জীবনযাপনই সর্বোচ্চ নান্দনিক প্রকাশ। এই ধারণাটি পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্বের মূলধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

প্রচলিত নন্দনতত্ত্বে শিল্পী ও দর্শক আলাদা— একজন সৃষ্টি করেন, অন্যজন উপভোগ করেন। শিল্পকর্ম একটি বিশেষ বস্তু— একটি ছবি, একটি কবিতা, একটি নৃত্য। গান্ধীর কাছে এই সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ। তাঁর মতে প্রতিটি মানুষই একজন সম্ভাব্য শিল্পী, কারণ প্রতিটি মানুষই তার নিজের জীবনকে নৈতিক ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারেন।

গ) উচ্চ ও নিম্ন শিল্পের বিভাজন প্রত্যাখ্যান: গান্ধী শিল্পের অভ্যন্তরীণ শ্রেণিবিভাজনকেও প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রচলিত নন্দনতত্ত্বে 'fine arts' ও 'craft'-এর মধ্যে যে মূল্যগত পার্থক্য করা হয়, তা মূলত একটি শ্রেণি-বিভক্ত সমাজের প্রতিফলন। যারা হাতের কাজ করেন— কুমোর, তাঁতি, কামার— তাদের শ্রম 'craft' বা কারিগরি বলে চিহ্নিত হয়। যারা তুলি বা কলম ধরেন, তারা 'শিল্পী' বলে সম্মানিত হন। গান্ধী এই বিভাজনকে নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন।

তাঁর কাছে সকল সৃজনশীল শ্রম সমান মূল্যের। একজন বেহালাবাদক ও একজন তাঁতি— উভয়েই সৃজনশীল কাজ করছেন, উভয়ের কাজেই আত্মার প্রকাশ ঘটছে। গান্ধীজির এই ভাবনা ভারতের জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ— কারণ জাতিভেদ-প্রথা নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষকে নির্দিষ্ট শ্রমে আবদ্ধ রেখে সেই শ্রমকে অবমানিত করেছে। গান্ধীজি সেই শ্রমকেই শিল্পের মর্যাদা দিয়ে একটি সামাজিক ও নান্দনিকতাত্ত্বিক বিপ্লবের সূচনা করেছেন।

গান্ধীজির মতবাদের সীমাবদ্ধতা: গান্ধীর নন্দনতত্ত্ব সংক্রান্ত মতবাদ তা সমালোচনামুক্ত নয়।

ক) শিল্পের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন: গান্ধী শিল্পের স্বায়ত্তশাসনকে যেভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক আপত্তি উঠতে পারে। Kant থেকে শুরু করে আধুনিক নন্দনতত্ত্ব পর্যন্ত একটি শক্তিশালী যুক্তি হলো, শিল্পের নিজস্ব একটি যুক্তি আছে— একটি অভ্যন্তরীণ নিয়ম ও স্বাধীনতা— যা নৈতিকতা বা রাজনীতির যুক্তি থেকে আলাদা। যদি শিল্পকে সম্পূর্ণভাবে নৈতিকতার অধীন করা হয়, তাহলে শিল্পী তাঁর সৃজনশীল স্বাধীনতা হারান এবং শিল্প একটি উপদেশমূলক বা প্রচারমূলক মাধ্যমে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ইতিহাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। যখনই কোনো রাজনৈতিক বা নৈতিক মতাদর্শ শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে— যেমন সোভিয়েত 'socialist realism' বা নাৎসি জার্মানির 'degenerate art' নিষিদ্ধকরণ— শিল্প তার প্রাণশক্তি হারিয়েছে। গান্ধীর নন্দনতত্ত্বের কঠোর নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, অনেক সমালোচকের মতে, শিল্পকে এই ধরনের নিয়ন্ত্রণের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

তবে এই আপত্তি পুরোপুরি প্রযোজ্য হতে পারে না। গান্ধী কোনো রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের কথা বলেননি— তিনি বলেছেন শিল্পীর নৈতিক দায়িত্বের কথা। এই দুটি অবস্থানের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে।

গান্ধীর কাছে নৈতিকতা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনো বাধ্যবাধকতা নয়, এটি শিল্পীর অন্তরের সত্যনিষ্ঠা থেকে উৎসারিত।

খ) কাল্পনিক অতীতমুখিতার সমস্যা: গান্ধীর শিল্পদর্শনের বিরুদ্ধে আরেকটি সমালোচনা হলো, এটি একটি আদর্শ অতীতের দিকে নির্দেশ করে। হস্তশিল্প ও লোকশিল্পের যে জগৎ গান্ধী কল্পনা করেছেন, তা অনেকাংশে একটি কাল্পনিক নির্মাণ। বাস্তবে ঔপনিবেশিক আমলের আগেও ভারতীয় কারিগরদের জীবন মোটেই আদর্শ ছিল না— জাতিভেদ-প্রথা, দারিদ্র্য ও সামাজিক বৈষম্য সেই জীবনকে কঠোর করে রেখেছিল। গান্ধী যন্ত্রসভ্যতার আগের যে সমাজের কথা বলেছেন, তা অনেকটাই তাঁর নিজের নৈতিক আকাঙ্ক্ষার কাল্পনিক রূপ।

তাছাড়া প্রযুক্তির সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান বাস্তবসম্মত নয়। আধুনিক চিকিৎসা, যোগাযোগ ও শিক্ষার জন্য যে প্রযুক্তি প্রয়োজন, তাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করলে মানুষের জীবনমান উন্নত হওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এই অর্থে গান্ধীর অবস্থান কিছুটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গান্ধীর নন্দনতত্ত্বের একটি গভীর ও স্থায়ী প্রাসঙ্গিকতা আছে। বাজারকেন্দ্রিক শিল্পের বিরুদ্ধে, শিল্পের পণ্যায়নের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান আজ আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারিগরি শিল্পের মর্যাদা রক্ষায়, পরিবেশবান্ধব উৎপাদন পদ্ধতির পক্ষে গান্ধীর ধারণার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা

ক) ডিজিটাল ও পণ্যায়িত শিল্পের যুগে গান্ধী: আজকের যুগে শিল্পের পণ্যায়ন একটি নতুন ও জটিল মাত্রায় পৌঁছেছে। NFT (Non-Fungible Token) আর্ট, AI-generated art— এই নতুন শিল্পরূপগুলো সৌন্দর্য ও মূল্যের সম্পর্ককে মৌলিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। একটি ডিজিটাল ছবি বহুমূল্যে বিক্রি হলেও সেই ছবির পেছনে কোনো মানবিক শ্রম নেই, কোনো নৈতিক উদ্দেশ্য নেই, কোনো সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই। শিল্পকর্ম এখন মূলত একটি আর্থিক বিনিয়োগের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। গান্ধীর দৃষ্টিতে এই প্রবণতা শিল্পের মানবিক সারসত্তাকে ধ্বংস করছে। টলস্টয়ের সংজ্ঞা অনুযায়ী যে শিল্প মানুষের মধ্যে নৈতিক অনুভূতি জাগাতে পারে না, যা মানুষকে মানুষের কাছে নিয়ে আসে না, তা প্রকৃত শিল্প নয়। AI যখন কোনো মানবিক অনুভূতি ও নৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া ছবি বা সংগীত তৈরি করে, সেটি গান্ধীর শিল্পসংজ্ঞার সঙ্গে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ সেখানে মানবিক শ্রম, নৈতিক উদ্দেশ্য, সৃজনশীল আত্মার প্রকাশ— কোনোটিই নেই।

খ) লোকশিল্প ও গান্ধীর নন্দনতত্ত্ব: বাংলার সমৃদ্ধ লোকশিল্প ঐতিহ্য— বাউল সংগীত, পটচিত্র, মৃৎশিল্প, কাঁথাশিল্প, বাঁশ ও বেতের কাজ— গান্ধীর নন্দনতত্ত্বের জীবন্ত উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে। এই শিল্পগুলোতে শ্রম, নৈতিকতা ও সৌন্দর্য স্বাভাবিকভাবেই অবিচ্ছেদ্য। একজন বাউল শিল্পী যখন গান করেন, সেখানে আধ্যাত্মিক সাধনা, নৈতিক বার্তা ও নান্দনিক সৌন্দর্য একীভূত হয়— ঠিক যেমনটি গান্ধী কল্পনা করেছিলেন। একজন পটচিত্রশিল্পী যখন রামায়ণ বা মনসামঙ্গলের কাহিনি আঁকেন, সেখানেও সামাজিক নৈতিকতা ও নান্দনিক সৃষ্টি পাশাপাশি চলে।

কিন্তু আজ এই লোকশিল্পগুলো গভীর সংকটের মুখে। বাজারের চাপে অনেক কারিগর তাঁদের ঐতিহ্যবাহী শিল্প ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। পর্যটনের চাহিদা মেটাতে লোকশিল্পের রূপ পরিবর্তিত হচ্ছে— ঐতিহ্যবাহী নকশার জায়গায় আসছে বাজারমুখী নকশা, যা বিক্রি হয় কিন্তু সমাজের সঙ্গে তার নৈতিক ও

আধ্যাত্মিক যোগ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। গান্ধীর দর্শনের আলোয় এই সংকটকে দেখলে বোঝা যায়, এটি শুধু অর্থনৈতিক সংকট নয়— এটি একটি নান্দনিকতাত্ত্বিক ও নৈতিক সংকটও।[11]

গান্ধীর কুটিরশিল্প আন্দোলনের ধারণা আজও বাংলার লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবনে প্রাসঙ্গিক। শিল্পকে বাজারের হাত থেকে রক্ষা করতে, কারিগরের সৃজনশীল স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখতে এবং শিল্পকে সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত রাখতে গান্ধীর দর্শন একটি শক্তিশালী বিকল্প কাঠামো প্রদান করে।

উপসংহার: গান্ধীর নন্দনতত্ত্ব পাশ্চাত্যের প্রচলিত শিল্পতত্ত্বের একটি মৌলিক বিকল্প। যেখানে পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্বের মূলধারা শিল্পকে নৈতিকতা থেকে আলাদা করে একটি স্বায়ত্তশাসিত ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেখানে গান্ধী শিল্প, শ্রম ও নৈতিকতাকে একটি অবিচ্ছেদ্য সমগ্রে পরিণত করেছেন। তাঁর কাছে সৌন্দর্য কোনো বিচ্ছিন্ন গুণ নয়— এটি নৈতিক জীবনযাপনের স্বাভাবিক ফল।

Tolstoy ও Ruskin-এর পাশ্চাত্য নৈতিক নন্দনতত্ত্ব এবং উপনিষদ, ভগবদ্গীতা ও জৈন দর্শনের ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে একত্রিত করে গান্ধী যে শিল্পদর্শন নির্মাণ করেছেন, তা একই সঙ্গে দার্শনিকভাবে গভীর ও রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। লোকশিল্পকে সাংস্কৃতিক ভিত্তি হিসেবে পুনর্মূল্যায়ন করে তিনি দেখিয়েছেন যে শিল্প কেবল মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীদের আনন্দের বিষয় নয়— শিল্প হতে পারে একটি গণতান্ত্রিক, নৈতিক অভিজ্ঞতা।

তাঁর নন্দনতত্ত্বের সীমাবদ্ধতা আছে— শিল্পের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে তাঁর অবস্থান কিছুটা কঠোর, এবং তাঁর অতীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গিতে কখনো কখনো একটি রোমান্টিক আদর্শায়নের ছায়া পড়ে। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা তাঁর দর্শনের মূল অবদানকে ম্লান করে না। বরং আজকের ভোগবাদী শিল্পজগতে, যেখানে শিল্প ক্রমশ পণ্যে পরিণত হচ্ছে এবং কারিগরের সৃজনশীল শ্রম বাজারের চাপে বিপন্ন হয়ে পড়ছে, গান্ধীর প্রশ্নগুলো আরও জরুরি হয়ে উঠছে।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ. হিন্দ স্বরাজ, নবজীবন পাবলিশিং হাউস, আহমেদাবাদ, ১৯০৯।

২। Gandhi, M.K, Collected Works of Mahatma Gandhi, Publications Division, Government of India, New Delhi, 1958-1994.

৩। Gandhi, M.K. Autobiography: The Story of My Experiments with Truth, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1927.

৪। Gandhi, M.K. In Search of the Supreme, Vol. 3. Edited by V.B. Kher. Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1962.

৫। Parekh, Bhikhu. Gandhi's Political Philosophy: A Critical Examination, Macmillan, London, 1989.

৬। Ruskin, John. The Stones of Venice, Smith, Elder & Co., London, 1851.

৭। Ruskin, John. Unto This Last, Smith, Elder & Co., London, 1862.

৮। Tolstoy, Leo. What is Art? Translated by Aylmer Maude. Oxford University Press, London, 1929.

[11] Ruskin, John. *Unto This Last.* Smith, Elder & Co., London, 1862, p. 156.